নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৮)

(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রীগিরীশ ঘোষ গিয়েছেন) গিরীশ—''বেশতো, তুমি নিজেই তোমার পূজা কর, তবে আমার তিথিরও পূজা হবে!'' একথা শুনে রামকৃষ্ণদেব বললেন — ''গিরীশ বড্ড ছেলে মানুষ, বলে কিনা, এবার থেকে তোমার জন্মতিথির পূজা করব; আরে যার জন্মও

নেই, মৃত্যুও নেই, তার আবার জন্মতিথি কোথা? ডাকছ যাকে ঠাকুর বলে, তার কি কোন জন্মতিথির খবর আছে? কোন আদিযুগে, কখন কি ভাবে যে সূর্য্য উঠেছিল তার কি কোন জন্মতারিখ আছে? সূর্য্যের যদি জন্মতিথি পাওয়া যায় না, তবে যে ঠাকুর এই সূর্য্যকে সৃষ্টি করেছে, তার কি করে জন্ম-তিথি পাওয়া যাবে? গিরীশ অত তলিয়ে বুঝতে চায় না ত, তাই মা যশোদার মত কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়। মানুষের যখন দেবশক্তির উপর এমনি এক প্রিয়ভাব এসে পড়ে, তখন সে যে এক মহামানব, তা বেশ বুঝতে পারা যায়'' ..... এই কয়টি কথা বলেই রামকৃষ্ণদেব নরেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গিরীশ উত্তর করলেন — ''ও সব হেঁয়ালি কথা বুঝি না— যাঁর কাছে মাথাটা আপনি নুয়ে পড়ে, তাঁকে নুড়ি পাথর বলে ত্যাগ করতে পারি না বরং তাঁকে ন্যাড়া শালগ্রামশিলা বলে প্রতি সালেই ষোড়শোপচারে পূজা করতে চাই, মন যা চায় তাই যেন পাই; কারণ আপনিই ত বলেন — মনই ভগবান; সুতরাং আমি যা চাইছি; তাও ভগবানের ইচ্ছাতেই চাইছি ... সত্যি কিনা বলুন'' ...

''তাতো সত্যিই, খাঁদাই হোক পেঁচাই হোক, মায়ের কাছে সব ছেলেই সমান; শ্বাশুড়ীর গোদাপায়ে যেমন বৌকে তেল দিতেই হবে, মানুষের মনের মাঝে যা উদয় হয়, তাকে সত্যি বলে নিতেই হবে, কিন্তু বিচার তো একটু করে নিবি যে, জ্যান্ত ঠাকুর আর পাথরের ঠাকুরে তফাৎ আছে!... তোর মত অন্ধ-বিশ্বাসের পূজা এসে গেলে রাতারাতি ''মা'' পাওয়া যায়। তোর এ সব জন্মগত জ্ঞান, নইলে এমন শিশুর মত কথা অথচ জগৎ শিশুর মত মুখের বুলি আসে না''...রামকৃষ্ণদেব নরেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—

শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ

গিরীশ হাসিমুখে বলে যেতে লাগলেন ... ''ভগবান আপনার বড্ড এক চোখো কিন্তু; কারো মাথায় তেল চুইয়ে পড়ে, কারো মাথার চুল রুক্ষু ওড়ে। আমিও সব পাথরের ঠাকুর বুঝিনা; জীবনে একটা পণই করেছিলুম — কখনও যদি জ্যান্ত ঠাকুর পাই, তবেই মাথা ঠুকবো, নইলে যে নেশার ঘোরে দিন কাটাচ্ছি, সেই নেশাতেই দিন কাটাব। এতদিন পর আপনাকে পেয়ে মনে হয় পাষাণ দেবতা বোধহয় আমার কথা রেখেছে।''

রামকৃষ্ণদেব হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বোলে উঠলেন— ''তুই দেখছি হাউই বাজী— আগুন পেলেই আকাশ ফাটাস্। তবে আর ভগবানকে এক-চোখো বলিস্ কেন? এখন বুঝলি তো, মা দু চোখ চেয়ে সবাইকে দ্যাখে, তবু তো তিন চোখের খবর পাস্নি; তা'হলে তুইও চার চোখে এক কাহন পেয়ে যাবি। ধারাপাতের বুড়ি-চোক পড়েছিস্ ত? চোখের ধারা যখন চোখের পাতায় ভ'রে ওঠে, তখনই তাকে ভক্তিমার্গের ধারাপাত বলে। এই ধারাপাত হলেই, সেই আদ্যাবুড়ির সে চোখে চোখে থাকে। মায়ের ছেলে মা চিনতে পারে, তখন মা পণ্‌কিয়া পড়ায়, যা চাইবি তখনই তা, সেই আদ্যিবুড়িমার কাছে পণে পণে গুণে পাবি,...বুঝলি?''

গিরীশ মৃদুহাসির স্নিগ্ধ সুর দিয়ে মৃদুস্বরে বলে যেতে লাগলেন—''না ঠাকুর, ও সব ধারাপাত আমি পড়তে পারব না, আমি ব'কলম দিয়েই খালাস... আপনি পাষাণ-প্রতিমার

সঙ্গে কথা কন, আমি জ্যান্ত-প্রতিমার সঙ্গে কথা কই, ও সব সাধন-তত্ত্ব থেকে দূরে থাকাই ভাল। কাজ কি আমার পাষাণ ঠুকে, জ্যান্তে যদি পেলুম মাকে! তা আপনি যাই বলুন না কেন, ভগীরথ অত কষ্ট ক'রে গঙ্গা আনলেন, কিন্তু ঘরে বসেই সগরবংশ তা পেয়ে গেল, সুতরাং ভগীরথের চেয়ে ওরাও কম রথী নয়! বরং সমান বলবো, তবু ছোট বলতে পারি না।''

এ কথায় বিবেকানন্দ খানিকটা কেঁপে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে গিরীশের চোখে চোখ রেখে, ধীরে গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—''আপনার কথায় সাবাস্ না দিয়ে থাকতে পারলুম না, একেই বলে, ভগবান চিরকাল ভক্তকে বড় করে থাকেন। নিজে তৃণাদপি সুনীচেন বলে ব্যক্ত করেন, সবারই পায়ের ধূলা মাথায় করেন, ভক্তকে বড় করেন, ভৃগুপদ-চিহ্ন কৃষ্ণ তাঁর নিজের বক্ষে ধারণ করেন, এ কথাও সত্য কিন্তু ভৃগুমুনিকে ভগবান বলব, না কৃষ্ণকে ভগবান বলব। বাপ-মায়ের অর্থ-সম্পত্তি তাদের ছেলেরা হয়ত আনন্দে ভোগ করতে পারে, কিন্তু তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। যাঁকে সামনে দেখছেন, যে রামকৃষ্ণদেবকে ঠাকুর বলে পূজা করছেন, যিনি নিরক্ষর হয়েও আমাদের অক্ষর দান করেছেন, যিনি পূজা করে আমাদের প্রসাদ দান করছেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত এবং ভগবান! আমরা তাঁর চরণে এসে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলে পূজা পেতে পারি না।''

একদিন মথুর বাবুর আর ঘুম হয়নি। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এসে শরীরে যেমন অবসাদ, অন্যদিকে আবার ক্ষণে ক্ষণে একটা আনন্দহিল্লোল তাঁর মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো; রামকৃষ্ণদেব যতই চিন্তা বিচারে চেনবার চেষ্টা করতে লাগলেন, ততই রামকৃষ্ণদেবের ছায়ামূর্ত্তি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল—এমন কি তাঁর বিছানার কাছে ঘুরতে ফিরতেও দেখতে পেলেন। মাঝে মাঝে আতঙ্ক এসে মনকে খানিক অসাড় করে দিল— পাশ ফিরে নিস্তব্ধে জেগে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর স্ত্রীও এই সময় হঠাৎ যেন কার স্পর্শে জেগে উঠলেন, চোখ চেয়ে দেখলেন কেউ নেই অথচ কাছ থেকে কে সরে গেল—ভাল করে চোখ মুছে ধীরে ধীরে মথুরবাবুর কাছে এসে পায়ের তলায় হাত বোলাতেই মথুরবাবু কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন— ''কে?''

—''তুমি জেগে আছ? আমার পায়ে হাত বুলিয়ে চলে এলে কেন?''

—''আমি? ... কই আমি ত, তোমার কাছে যাইনি—তুমি এসব কী কথা বলছ?''

—''তুমি যাওনি? তবে আমি যাঁকে দেখলুম, তিনিই কি? হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখলুম রামকৃষ্ণদেব যেন আমার পায়ের কাছ থেকে চট্ করে সরে গেলেন—আমার বাপু একটু ভয় ভয় করছে—তোমার কাছাকাছি আমার বিছানাটা নিচ্ছি—কিছু মনে করো না।''

মথুরবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন এবং স্ত্রীর হাতদুটো ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি রামকৃষ্ণদেবকে দেখলে? আমি এতক্ষণ মনে করেছিলুম আমার চিন্তারাশিই যেন তাঁর উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে। সবই মনের ধোঁকা বা চোখের ভুল কিন্তু এখন বুঝছি তাতো নয়। তুমি ঘুমন্ত অবস্থাতে হঠাৎ জেগেই বা উঠলে কেন আর এত লোক থাকতে তাঁকে বা দেখলে কেমন করে? ঘিয়ের প্রদীপটা একটু জোর করে দাওতো। ঐ সোনার গেলাসটি করে খানিক টাট্‌কা গোলাপ ভেজানো জল দিতে পার? গলাটা একটু যেন শুকনো মনে হচ্ছে?''

—''সোনার গ্লাসে গোলাপ জল কে রেখেছে? এ গ্লাসত সাধারণতঃ বাইরে আমি রাখি না—তুমিই বার করেছ?''

এ কথায় মথুরবাবুর বিস্ময় আরও একটু বেড়ে গেল। মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে এসে দাঁড়ালেন আর বলে যেতে লাগলেন—''আজ আমাদের বিয়ে—সবই যেন নূতন বাড়ীতে এসে নূতন ঠেক্‌ছে... এ গ্লাস তুমি যদি বার করনি তবে যে নূতন অতিথি ঘরে এসেছেন এ নিশ্চয়ই তাঁরই কাজ—কই জলের গ্লাসটা আমার হাতে দাওতো!''

—''ইস্ এ কি করলে? গ্লাসটা ভাল করে ধরতে পারলে না? সব জল যে আমারই গায়ে-পায়ে ছড়িয়ে গেল! কিন্তু কী অপূর্ব্ব সুগন্ধ বলতো! এমন মধুর স্নিগ্ধ সুগন্ধ তো কখনও পাইনি। আজ যেন ইন্দ্রপুরীতে পারিজাত পুষ্প এসেছে। কই, তুমি কথা কইছ না যে। ঐ গ্লাসে করেই জল এনে দিচ্ছি—তোমার হাত থেকে পিছলে গেল কেমন করে?''

মথুরবাবু আর কথা কইতে পারলেন না—কোঁচার ডগায় চোখ মুছতে মুছতে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন, রাজকন্যাকে ভারী গলায় শুধু বলে উঠলেন—''এবার শুয়ে পড়, এখন আর আমার কোন তৃষ্ণাই নেই।''

.....ক্রমশঃ